শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন

শিক্ষা কনভেনশন

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, টিএসসি মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- স্কুলে কোচিং-ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ কর। শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ করে স্কুলকে শিক্ষার মূল কেন্দ্রে পরিণত কর।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নিরসন করতে হবে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম-স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ করে ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত কর।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট কোর্স ও ফি বৃদ্ধি বন্ধ কর। ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাতিল কর।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস করে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংসের চক্রান্ত বন্ধ কর।
- শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন-ভাতা, সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত কর।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন

'শিক্ষা হচ্ছে আলো', চেতনাক তা আলোকিত করে। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড', জাতির মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভিত তৈরি করে। জীবনের ঊষা লগ্নে যে কথাগুলোর সাথে পরিচয়ের সূত্রে শিক্ষা জীবনের সূচনা ঘটে, আমাদের সরকার বা শিক্ষার কর্তাব্যক্তিরা সেটাকে আদৌ কতটুকু বিশ্বাস করেন? যদি করতেনই, দেশ-জাতিকে এগিয়ে নেবার যেসব কথা তারা মুখে বলেন, কাজে তা বিশ্বাস করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের এ দেশে শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই নেবার কথা। কিন্তু তা না করে শিক্ষাকে ক্রমাগত বেসরকারিকরণের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য কী? বাজার উপযোগিতা, চাকুরিমুখীনতার কথা বলে কিংবা মুক্তবাজারের ধুয়ো তুলে শিক্ষার বাজারিকরণ কি আদৌ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 'মানুষ তৈরি', 'চরিত্র গঠন' এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

একসময় প্রশ্ন ফাঁসের কথা কদাচিৎ শোনা যেত। এখন এটা হরহামেশা ব্যাপার। ভালো রেজাল্ট করতেই হবে, ফলে প্রস্তুতি ভালো এমন শিক্ষার্থী-অভিভাবকরাও ভালো ফলের আশায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সন্ধানে ছুটছেন। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে থাকবে কেন? জনৈক অভিভাবকের ভাষায় 'আমি যদি আমার সন্তানের জন্য প্রশ্ন যোগাড় না করি, তাহলে তার রেজাল্ট খারাপ হবে। কিন্তু বাকিরা প্রশ্ন পেয়ে রেজাল্ট ভালো করবে। আমি কি আমার সততা রক্ষা করার জন্য ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?' নৈতিক বোধ-বুদ্ধি সবকিছুই হার মানছে 'ভবিষ্যৎ' নষ্ট না করার বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে! ভালো ডিগ্রি মানে তো ভালো চাকুরি! শিক্ষার নানা ধাপ পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের কেউ ডাক্তার হবেন, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা কেউ বিসিএস উত্তীর্ণ হয়ে ভালো চাকুরিটি পাবেন– কিন্তু তাতে সমাজের জন্য শুভ বা ইতিবাচক কোনো ফল তৈরি হবে কি? স্বার্থপরতার সমাজ বলে যে সমাজকে আমরা অহরহ চিহ্নিত করি, তার উৎকট ভবিষ্যৎ কতটা দেখতে পাচ্ছি?

পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার তুলে ধরে সরকার কৃতিত্ব জাহির করছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের শ্রম-চেষ্টার কিছু ফলাফল তো আছেই। কিন্তু তাই বলে যত গর্জন তত অর্জন কি? মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন? পাশের হার, এ প্লাসের সংখ্যা জাহির যেখানে বড় ব্যাপার, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া এ প্লাস প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৫৫ ভাগ ফেল করলে কি আর এসে যায়! দুর্মুখেরা কত কথাই বলে! আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগের গল্প সবাই জানে। দীনহীন আলাদিন চেরাগে ঘষা দিয়ে দৈত্যের বদন্যতায় জীবন পাল্টে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরের দীনহীন দশা না পাল্টেই কোন জাদুর চেরাগের বদৌলতে শতভাগ বা নব্বই ভাগের বেশি পাশ হচ্ছে? মন্ত্রী-আমলাদের কাছে এর জবাব নেই। অথচ আমরা জানি, গ্রামের স্কুলগুলোতে ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়ানোর মতো শিক্ষক নেই। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ল্যাবরেটরি নেই ৭৮ ভাগ স্কুলে। এতদসত্ত্বেও পাশ হচ্ছে প্রায় শতভাগ!! এরা ভর্তি হবে কোথায়? এমনকি এ প্লাস প্রাপ্ত বেশিরভাগেরই পরবর্তী ধাপে মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ নেই। কারণ মানসম্মত প্রতিষ্ঠান যে হাতে গোনা। তারপরও অভিভাবকদের চেষ্টার অন্ত নেই। অপরাপর চাহিদা খাটো করে হলেও সন্তানদের যেকোন মূল্যে তারা পড়াতে চান। স্কুল-কলেজের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছেও। কিন্তু সেগুলোতে সাধারণ মানুষের সন্তানদের পড়ার সুযোগ কতটুকু থাকছে? অব্যাহত বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ নীতির ফলে সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন স্কুল কলেজ নিমার্ণ করা হচ্ছে না। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কেবল শিক্ষার দুয়ারে আসতে পারছে না তাই নয়, অর্থের বিনিময়ে যারা শিক্ষিত হচ্ছে তাদের নৈতিক চেতনাকেও ধসিয়ে দিচ্ছে।

বিষয়বস্তুর অর্থেও ভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা। যে বিষয়বস্তু একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক-যুক্তিবাদী-সৃজনশীল-বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলবে তার চর্চা কোথায়? সংবিধান নির্দেশিত 'একধারার শিক্ষা' সংবিধান রচনার পরদিন থেকেই উপেক্ষিত। কেবল প্রাইমেরি স্তরেই আছে ১১ ধরনের বিদ্যালয়। পাশাপাশি জগৎ-জীবন সম্পর্কিত আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাপুষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রম প্রসার ঘটানো হচ্ছে। জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরির উপযোগী সমন্বিত শিক্ষার পরিবর্তে একপেশে ও খণ্ডিত কারিগরি শিক্ষার উপর জোর আরোপ করা হচ্ছে। এ সবই চলছে বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী মনন ও দক্ষতা তৈরির লক্ষ্যে। ফলে অতীতের চেয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়লেও প্রকৃত মানুষ তৈরির শিক্ষা ও পরিবেশ চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানেও উচ্চতর চেতনাবোধের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর (ছাত্রলীগ কর্মী) হাতে সাদ নামের এক ছাত্র (একই সংগঠনের কর্মী) খুন হলো। কেবল খুন নয়, ধর্ষণ-অপহরণ-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিসহ হেন অপকর্ম নেই যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে গোটা সমাজ জুড়ে ঘটছে না। বুর্জোয়া ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের প্রভাব বলয়ে থাকা ছাত্র-যুব সমাজের চরিত্র অধঃপতিত হচ্ছে। শিক্ষকদের একাংশ এর থেকে মুক্ত নয়। অবক্ষয় এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মতো অভিযোগ উঠছে, অনেকক্ষেত্রে তার সত্যতাও মিলছে। অনেকে আবার শিক্ষা বাণিজ্যের পক্ষে নির্লজ্জ অবস্থান নিচ্ছেন। যা ছাত্রদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

শিক্ষার উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ বাস্তবে সংকট জর্জরিত এ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। বিগত মহাজোট সরকারের আমলে প্রণীত 'শিক্ষানীতি ২০১০' শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণেরই একটি দলিল। এ শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা বাণিজ্যের সকল রাস্তা খুলে দেয়া হয়েছে। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থি ভোগসর্বস্ব, উন্নাসিক, কূপমণ্ডুক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রজন্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে গরীব-মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীরা কেবল বঞ্চিত হবে না, মনুষ্যত্ব বিনাশের প্রক্রিয়াটি বাধাহীনভাবে চলতে থাকবে। ফলে একদিকে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, একইপদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে যেমন লড়তে হবে; পাশাপাশি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণ ও শিক্ষা সংকোচনের এই সময়ের বিশেষ পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যেই আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আমরা কনভেনশন আয়োজন করেছি। সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ শিক্ষানুরাগী মহলকে এ লড়াইয়ে আমরা আহ্বান জানাই।

স্বাধীনতার পরেও সব সরকার সর্বজনীন শিক্ষার দাবিকে উপেক্ষা করেছে

শিক্ষা হলো সামাজিক সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। মানবজাতি সেই সুদূর অতীত থেকে একদিকে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য, অন্যদিকে ক্রমাগত সমাজকে পাল্টানোর জন্য যে সংগ্রাম করে এসেছে তাই সংগৃহীত, সুবিন্যস্ত হয়ে মানুষের জন্য শিক্ষা হিসেবে এসেছে। কোনো এক যুগে অসংখ্য মানুষের সংগ্রামে যে জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি হয় তা পরবর্তী যুগে নতুনকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে আবার চিন্তার নবতর উন্মেষ ঘটে, যা পরবর্তী সভ্যতাকে এগিয়ে দেয়। এভাবে যুগে যুগে শিক্ষা-চিন্তার বিকাশ ঘটে। তাই বলা যায়, শিক্ষা কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পদ নয়, গোটা মানবজাতিরই সংগ্রামের ফসল। একারণে শিক্ষার অধিকার সর্বজনীন। শিক্ষা মননশীলতা-সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ শেখায়। শরীরের জন্য যেমন খাবার লাগে, মনকে বাঁচিয়ে রাখতে-মনুষ্যত্বের বিকাশেও তেমনি শিক্ষার প্রয়োজন। একজন মানুষকেও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে মানবিক জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

মহান রাশিয়ান সাহিত্যিক টলস্টয় বলেছিলেন- 'জনগণের অজ্ঞতাই শাসকের শক্তির উৎস'। জনগণকে অজ্ঞ রাখা যায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখলে। তাই যুগে যুগে শাসকরা সেই চেষ্টাই করে এসেছে। একই ব্যাপার আমরা স্বাধীনতার পূর্বাপর সকল শাসকের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে দেখতে পাব। বৃটিশ যুগে ইংরেজ শাসকরা তাদের শাসন উপযোগী একদল অনুগত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল বলে তার পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল অল্প কিছু মানুষকে তারা এমনভাবে শিক্ষিত করবে যারা রক্তে-বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ। সেদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরাও ইংরেজদের সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। পাকিস্তানি আমলেও তৎকালীন শাসকদের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে গড়ে উঠে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। অধিকার বঞ্চিত বাঙলি জাতির চেতনায় এ আন্দোলন নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। 'শরীফ কমিশন' খ্যাত সেই শিক্ষানীতি ছিল বাস্তবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের একটি প্রস্তাবনা। সেই শিক্ষানীতিতে ৬০ ভাগ বেতন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করার সুপারিশ ছিল। মূলত উচ্চশিক্ষাকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে তারা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ আরও অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে শাসক গোষ্ঠী সেই শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়। সেদিন ছাত্ররা দাবি তুলেছিল, ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে, প্রত্যেক জেলায় নতুন সরকারি কলেজ নির্মাণ করতে হবে, শিক্ষাখাতে ২৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি। পুরো ষাটের দশক জুড়ে শিক্ষার দাবিতে একের পর এক ছাত্র আন্দোলন শাসকশ্রেণীর ভিতে কাঁপন ধরিয়েছিল। সর্বজনীন শিক্ষার দাবি সেদিন এদেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের গণআকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়।

আজ থেকে প্রায় ৫২ বছর আগে পরাধীনতার কালে এদেশের ছাত্ররা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে ব্যাপ্তি ও পরিসরে ভেবেছিলেন, শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় তা আজও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সেদিন ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবি থাকলেও ২০১৪ সালে এসেও তা অষ্টম শ্রেণীর গণ্ডি পেরুতে পারেনি। অথচ আজ দুনিয়াব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটেছে তাতে অন্তত স্নাতক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার স্তর থাকা উচিত ছিল। দু:খজনক কথা হলো, দেশে এখনও শিক্ষার আওতায় মধ্যে আসতে পারেনি ১০ ভাগ শিশু। ২০১০ শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, 'বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ করার আগে ঝরে পড়ে।' উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত আসতে পারে ৫-৬ শতাংশ। একদিকে মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য, অভাব, অন্যদিকে সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে শিক্ষার প্রতিটি ধাপে ছাত্র ঝরতে থাকে। রাষ্ট্রের সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু কতটুকু দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ৯৫ শতাংশ পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারিখাতে। ৮২,২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭,৬৭২টি সরকারি। বাদবাকি স্কুলগুলোর মধ্যে আছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত স্কুল, রেজিস্টার্ড বেসরকারিসহ ১১ ধরনের স্কুল। ১৮,৭৯৫ টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩১৭ টি সরকারি। কথায় কথায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধানের দোহায় পাড়েন। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কোনো শিক্ষানীতিতেই সংবিধানের প্রতিফলন ছিল না। প্রথম

শিক্ষানীতি কুদরত-ই-খুদা'র শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে সর্বশেষ প্রণীত কবীর চৌধুরীর শিক্ষা কমিশনেও 'টাকা যার শিক্ষা তার' নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

পুঁজিবাদী নিয়মই শিক্ষার অধিকারকে বিপন্ন করে

স্বাধীনতার পূর্বে তো বটেই, এর পরবর্তীতেও দেশের ক্ষমতায় আসা প্রতিটি সরকার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং সংকোচনের নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছে। তাদের প্রণীত শিক্ষানীতি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কুদরত-ই-খুদা থেকে সর্বশেষ শিক্ষানীতি-২০১০ এ সবগুলোতে ভাষার পার্থক্য থাকলেও নীতিগত অবস্থান ছিল একই। সবার কথা এক, সরকার শিক্ষার দায়িত্ব নেবে না। এর পেছনের কারণ খুঁজতে গেলে দেশের অভ্যন্তরের অর্থনীতির নিয়মটিকে আমাদের বুঝতে হবে।

যে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ লড়াই করেছিল সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম ছিল পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার পর যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এদেশের বুকে চেপে বসেছে তারও নাম পুঁজিবাদ। এ হলো এমন এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের মালিকানা থাকে অল্প কিছু মানুষের হাতে। যাদের সাথে উৎপাদনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এখানে শ্রমজীবী জনগণ হলো উৎপাদনের শক্তি। উৎপাদনে অংশ নিয়ে তারা যে মজুরি পায় তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বৃত্ত তৈরি করে। এভাবেই মালিকের পুঁজি বাড়ে। এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদিত সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সমাজে তৈরি হয় দুটি শ্রেণী। ধনী-গরীবের ব্যবধান বাড়তে থাকে। একদিকে অল্প সংখ্যক ধনী অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র সাধারণ মানুষ। এই দরিদ্র জনগণ ক্রয় ক্ষমতার অভাবে বাজারের পণ্য কিনতে পারে না। কিন্তু উৎপাদন বাড়তে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় অতি উৎপাদনের সংকট। অতি উৎপাদন মানে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত। এ অবস্থায় অন্যান্য কারখানাগুলোর পণ্যও অবিক্রিত থেকে যায়। ক্ষতি পোষাতে মালিকরা প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিকদের ছাটাই করে, কখনও মজুরি কমিয়ে দেয়। আবার একই রাষ্ট্রীয় সীমানায় পুঁজিপতিরা নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। একদল পুঁজিপতি তাদের বিপুল সম্পদ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বাজার সংকট আরও তীব্র হয়, শুরু হয় মন্দা। এই সংকট কাটাতে বড় বড় পুঁজির মালিকেরা, দেশে দেশে বাজার দখলের জন্য হন্যে হয়ে ছোটে। পুঁজিবাদের এই অবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজির মালিকেরা দেশে দেশে বাজার দখল, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ লুটের জন্য যুদ্ধ বা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদীরা এ পর্যন্ত বাজার দখলকে কেন্দ্র করে দুটো বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীরা অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি'র মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে শোষণের নতুন কায়দা হাজির করে। নানা চুক্তি, সমঝোতা করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা তৈরি করে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে এই প্রক্রিয়াটি আরও অবাধ হয়ে উঠে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভ্যন্তরের নীতিটিই এমন যে এখানে সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা যায় না। কেননা পুঁজির টিকে থাকা বা স্ফীত হওয়ার শর্তই হলো অন্য পুঁজিকে গ্রাস করা এবং ক্রমাগত একচেটিয়াকরণের পথে হাঁটা। এ নাহলে পুঁজি বাঁচবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। সারাবিশ্বে পুঁজিবাদ আজ কতটা একচেটিয়া রূপ নিয়েছে তার প্রমাণ মিলবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফামের গত ১৯ জানুয়ারি' ১৪ তে প্রকাশিত একটি তথ্যে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ৮৫ জনের মোট সম্পদের পরিমাণ অর্থমূল্যে ১.৭ ট্রিলিয়ান ডলার যা বিশ্বের ৩৫০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যাবে। স্বাধীনতার পর যেখানে কয়েকজন মাত্র কোটিপতি ছিল সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী (৩১ ডিসেম্বর ২০১৩) বর্তমানে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এরাই বাংলাদেশের সিংহভাগ সম্পদের মালিক। ক্ষুদ্র এই শ্রেণীটিই দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে পরিচালনা করে। তাদের প্রয়োজনেই এখানকার বড় বড় দলগুলো পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসেবে দেশ পরিচালনা করে, আইন-কানুন, রীতি-নীতি সবকিছুই তাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেহেতু সমাজের সব মানুষের কর্মসংস্থান দিতে পারে না, তাই জনসংখ্যার বড় অংশকে শিক্ষার আওতার বাইরে রাখে। কারণ অশিক্ষিত মানুষেরা রাষ্ট্রের কাছে নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে যতটুকু শিক্ষা দেয় সেখানেও সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে ব্যয় বহুল করতে থাকে। ফলে সমাজের বৈষম্যের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ে শিক্ষার বৈষম্য। যাদের টাকা আছে তারাই তথাকথিত ভালো স্কুল কলেজের শিক্ষার দরজায় ঢুকতে পারে।

ব্যবসায়ীদের জন্য শিক্ষা এখন বিনিয়োগের ক্ষেত্র

বিশ্বব্যাপী বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলো গত শতাব্দীর ৯০ দশকের পর থেকে তীব্র বাজার সংকটে পড়েছে। এ সংকট থেকে বাঁচার জন্য তারা পুঁজি বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে থাকে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় পুঁজিপতিরা দেখছে, কারখানার বিনিয়োগে লোকসানের ঝুঁকি, শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা সমস্যা। সে তুলনায় শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ অনেক দিক থেকে নিরাপদ। ফলে ব্যবসায়ীদের নিশ্চিত মুনাফার জন্য শিক্ষা বিনিয়োগের বড় ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে এটিকে কার্যকর করতে

একটি বিশ্বচুক্তি করেছে যার নাম গ্যাটস (GATS-General Aggrement on Trade in Services)। বিশ্বায়নের কথা বলে দেশে দেশে জাতীয় বাজার উন্মুক্ত করে অতিরিক্ত ও অলস পুঁজি খাটাতেই তারা এই প্রস্তাবনা এনেছিল। এ চুক্তির আওতায় স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, পরিবহন, বীমা, ব্যাংক, টেলিকমিউনিকেশনসহ ১৬১টি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে বিনিয়োগের জন্য চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশও এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তিপত্রের অন্যতম কথা হলো- যে পরিষেবাখাতগুলো গ্যাটসের আওতায় আসবে, সেগুলোতে রাষ্ট্র ভর্তুকি দিতে পারবে না। দেশি-বিদেশি পুঁজি এই খাতে ব্যবসা করতে পারবে। তাই ভর্তুকি বন্ধ কর, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি বেসরকারিকরণ কর।

এই নীতি অনুসারে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। যেখানে ১৯৯২ সালের আগে ১টিও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না সেখানে এখন এর সংখ্যা ৭৯টি। স্কুল পর্যায়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই এখন প্রধান ধারা। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার, সেসময় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার। ব্যানবেইসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (২০১২) সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় একই থাকলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ হাজারে, যার বেশিরভাগই বাণিজ্যিক (তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ১ জুন '১৪)। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত ১০ বছরে কয়েকগুণ ফি বেড়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সান্ধ্যকোর্স খুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। দেশে বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ৮০টি। এর মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬২টি, যেখানে গড়ে ভর্তি ফি ১৮ লাখ টাকা। বিভিন্ন দৈনিকে এসেছে, গত বছর বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তিতে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই নীতি চলছে।

বাণিজ্যিকীকরণের অক্টোপাসে আক্রান্ত স্কুল শিক্ষা

কিছু পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন, পরীক্ষার নাম পরিবর্তন, কাগুজে আইন করেই শিক্ষাক্ষেত্রে সফল মন্ত্রীর তালিকায় এসেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম। বছরের শুরুতে বই প্রদানের মাহাত্ম্য প্রচার করে সরকার ব্যর্থতার অন্যসব দায় ঢেকে ফেলতে চায়। বই দেয়া সরকারের দায়িত্ব হলেও দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা কী? তীব্র শিক্ষক সংকট, বেসরকারি স্কুলগুলোর লাগামহীন ফি বৃদ্ধি, শিক্ষকদের আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রশিক্ষণহীনতা, খেয়াল খুশিমত নতুন পদ্ধতি আরোপ করা, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিসহ অন্যান্য আয়োজনের ঘাটতিতে শত সমস্যায় জর্জরিত স্কুলগুলো।

পাশের হার প্রতি বছর বাড়ছে, বাড়ছে জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা। কিন্তু এটা কতটুকু সরকারের কৃতিত্ব, তা স্কুলগুলোর বেহাল দশা আর শিক্ষার মান দেখলে বোঝা যাবে। সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষার উপর সমীক্ষা চালায় বিশ্বব্যাংক। প্রতিবেদনে বলা হয়, পঞ্চম শ্রেণিতে ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী বাংলায় আর ৬৭ ভাগ শিক্ষার্থী গণিতে এবং ৮ম শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ৫৪ এবং গণিতে ৫৬ জন শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করে না। এ অবস্থায় বাহবা কুড়ানোর জন্য উদার হস্তে উত্তরপত্রের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রায় শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অবশ্য সরকার নিতে পারে!

সৃজনশীল প্রশ্ন চালু ; ৫ বছরের অভিজ্ঞতা কী?

মুখস্থ বিদ্যা, গাইড বই এবং কোচিং এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হলো। আশা করা হলো, এখন থেকে মুখস্থ বিদ্যা, গাইড, কোচিং আর থাকবে না। কল্পনা আর মেধাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটাবে। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে গত ৪ বছরে বাড়তে থাকল জিপিএ ৫ এর সংখ্যা আর পাশের হার। গত ৫ বছরে স্কুলগুলোতে কী এমন পরিবর্তন এসেছে যে কারণে রেকর্ড সংখ্যক পাশের হার বেড়েছে? সরকার যতই উন্নতির ঢাক বাজাক আসলে বাস্তব অবস্থা এরকম নয়।

২০১০ সালে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নাম পাল্টিয়ে স্কুল পর্যায়ে এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রথমবারের মত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়। প্রবর্তনের ৪ বছর পর সম্প্রতি সরকারের পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মা উ সি) সারা দেশে সৃজনশীল পদ্ধতির উপর গবেষণার প্রতিবেদন প্রদান করে। 'একাডেমিক সুপারভিশন' নামের এই অনুসন্ধানে দেখা গেছে ৫৫ ভাগ স্কুলের শিক্ষক এ পদ্ধতির প্রশ্ন করতে সক্ষম। কিন্তু এই পদ্ধতিতে একেবারেই প্রশ্ন করতে পারে না ১৭ ভাগ শিক্ষক। বাকি ২৭ ভাগ মাঝামাঝি পর্যায়ের। অর্থাৎ এই সব প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশ্ন করতে পারে আর কিছু প্রশ্ন অন্য বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ বা কিনে এনে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে অবস্থা আরও হতাশাজনক। গত বছর সরকার গণিত বিষয়টিকেও সৃজনশীল পদ্ধতির অধীনে আনে। শুরুতেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এর বিরোধিতা করে। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও কোনো ধারণা দেয়া হয়নি। পরে দেখা গেছে, গত বছর অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ফেল করে। সারাদেশে সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক রয়েছেন রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। সেখানে যদি এই দশা হয় তাহলে সারা দেশের

চিত্র কি তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীতে উদারভাবে খাতা মূল্যায়ন করার নির্দেশনা দেয়ার পরও গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী গণিতে ফেল করেছে।

প্রশিক্ষণের অভাব, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক, অপ্রতুল আয়োজন

স্কুলগুলোতে আছে তীব্র শিক্ষক সংকট। পত্রিকায় এসেছে ৩২৩টি সরকারি স্কুলে ২১৩টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। আবার ১৫৩২টি সহকারি শিক্ষকের পদ ফাঁকা পড়ে আছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। পত্রিকায় এসেছে, নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে জীব বিজ্ঞান, ভূগোল ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে একটি করে পদ থাকলেও কোন শিক্ষক নেই। ভৌত বিজ্ঞানে দু'জন শিক্ষকের জায়গায় আছেন একজন। সমাজ বিজ্ঞানেও একই অবস্থা। সেই একমাত্র শিক্ষকও প্রশিক্ষণে আছেন। আর বাংলার তিনজন শিক্ষকের জায়গায় আছেন মাত্র একজন। (প্রথম আলো-১৪ ফেব্রুয়ারি'১৪) সরকারি স্কুলগুলোর যখন এ অবস্থা, তাহলে বুঝতে হবে বাকি থাকে না গ্রাম বা মফস্বলের বেসরকারি স্কুলগুলোর পরিস্থিতি কী? ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক সংকট প্রায় প্রতিটি স্কুলে। সরকার শিক্ষানীতিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ এর কথা বলছে। কিন্তু স্কুলগুলোতে এক সেকশনের জন্য বিষয়ভিত্তিক একজনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার নীতি নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে একজন শিক্ষককেই একাধিক বিষয়ের উপর ছয়টি শ্রেণীতে ক্ষেত্র বিশেষে ৮ ঘন্টা করে ক্লাস নিতে হয়। এ অবস্থায় ৪৫ মিনিট সময়ে একজন শিক্ষকের পক্ষে ক্লাস ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা, বুদ্ধি আর কল্পনা শক্তির বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। আর একজন শিক্ষকেরও সৃজনশীলভাবে পড়ানোর যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তাও তিনি সময়ের অভাবে পারেন না। ফলে প্রাইভেট বা কোচিংই যেন শেষ ভরসা।

সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুষঙ্গিক আয়োজনের অভাব। বিজ্ঞানাগার এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের চরম সংকট স্কুলগুলোতে। ২০১২ সালে 'সেভ দ্য চিলড্রেনের' অর্থায়নে পরিচালিত 'চাইল্ড পার্লামেন্ট' দেশের ৬৪ জেলায় এক জরিপ পরিচালনা করে। এতে ২৪২ জন শিক্ষার্থী এবং ২০৩ জন অভিভাবক অংশ নেন। জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৬১.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে তাদের ব্যবহারিক ক্লাশ হয় না। ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে বিজ্ঞানাগারের জন্য তাদের অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিজ্ঞানাগার না থাকা এবং ব্যবহারিক ক্লাস না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় সৃজনশীলতার সফলতা কীভাবে আশা করা যাবে? এছাড়া প্রায় প্রত্যেক স্কুলের লাইব্রেরি অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। সাংস্কৃতিক চর্চা, ললিত কলা শিক্ষার প্রায় কোনো আয়োজন নেই। এসব আয়োজন না করে শুধু প্রশ্ন পদ্ধতি পাল্টিয়ে আর পাশের হার বাড়িয়ে যারা হাততালি আশা করে, তাদের প্রতারক ছাড়া আর কি বলা যায়?

স্কুল নয়, শিক্ষা এখন কোচিং-টিউটর-গাইডবইমুখি; খরচ বাড়ছে অভিভাবকের

সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষার্থীরা টেক্সট বইয়ের পরিবর্তে উল্টো গাইড বই নির্ভর হয়ে যায়, ক্লাস শুরুর দুই এক মাস পরেই। আগে যেখানে একটি কোম্পানির গাইড কিনলে চলত, এখন বেশি বেশি উদ্দীপক পেতে একাধিক গাইড কিনতে হয়। গাইড কেবল যে শিক্ষার্থীরা কিনছে তা নয় শিক্ষকরা পর্যন্ত তা দেখে ক্লাসে পাঠদান করেন। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষক প্রশিক্ষক বলেছেন, 'পাঠ্য পুস্তকে সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা দেয়া থাকে দু একটি করে। অন্যদিকে গাইড বইগুলোতে নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া থাকে অসংখ্য। ভালো ফলাফলের আশায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক এমনকি ক্লাসের চাপে ক্লান্ত শিক্ষক সবাই গাইডমুখি হয়ে পড়েছে। প্রায় সব শিক্ষকই বাজারে প্রচলিত গাইড বইগুলোতে যে নমুনা দেয়া থাকে এবং পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো দেয়া হয় তা অনুসরণ করে শুধু নাম পাল্টিয়ে প্রশ্ন করেন। যার কারণে সৃজনশীল প্রশ্নই এখন গতানুগতিক হয়ে গিয়েছে।' (সমকাল ৪ ফেব্রুয়ারি' ১৪)

অধিকাংশ ছাত্র আগে যেখানে বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে কোচিং করত এখন বাংলা বা সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোর জন্য তাকে কোচিং এ যেতে হচ্ছে। কারণ স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বা তারা সব বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত ক্লাস নিতে পারেন না। ফলে স্কুল এবং স্কুলের বাইরে কোচিং ব্যবসা বেশ রমরমা। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোচিং নীতিমালা স্কুলে কোচিং ব্যবসাকে একেবারে বৈধ করে দিয়েছে। রাজধানীসহ সারা দেশে সব স্কুলগুলোতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে সব শিক্ষার্থীদের কোচিং করানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার মতো বিষয়গুলোও কোচিং করতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান চট্টগ্রাম শহরের ১৪টি ভাল মানের স্কুলের কিছু স্কুল ও শিক্ষার্থীদের উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন- একজন অভিভাবক তার সন্তানের স্কুল শিক্ষার জন্য গড়ে মাসিক ৬,০৮৪ টাকা খরচ করেন। খরচের বোঝার সবচেয়ে বড় চাপ আসছে কোচিং বাবদ যা মোট খরচের ৩৯%। নিম্নবিত্ত পরিবারের ১০ ভাগ শিক্ষার্থী খরচ সাশ্রয় করে এসব স্কুলে টিকে থাকে।

অন্যদিকে প্রতিবছর ভর্তির মৌসুমে ফি নিয়ে চলছে নৈরাজ্য। সরকার ভর্তি ফি সংক্রান্ত নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মফস্বল এলাকায় যেমন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্ব-সাকুল্যে ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১ হাজার টাকা, পৌর (জেলা) এলাকায় ২ হাজার টাকা, ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মহানগরে ৩ হাজার টাকা এবং ঢাকা মহানগরে ৫ হাজার টাকার বেশি হবে না। এ পরিমাণ টাকাও সাধারণ মানুষের জন্য বেশি। বাস্তবে ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কেউ মানছে না। সরেজমিনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আর বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করার পরও পুন:ভর্তির নামে টাকা নেওয়ার সংস্কৃতি অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়মে পরিণত হয়েছে। এর বাইরে নামে বেনামে রশিদবিহীন ফি তো আছেই। আবার স্কুলে কোচিং-এর নামে বাধ্যতামূলক ফি আদায় করা হচ্ছে। এর সাথে এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়। এসব কারণে গরীব নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবন হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। অন্যদিকে সন্তানের পড়ালেখার মান নিশ্চিত করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ১২ লক্ষ শিক্ষার্থীর নিরন্তর দুর্ভোগের প্রতিষ্ঠান

দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবার থেকে উচ্চশিক্ষায় আসা সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্রদের আশ্রয়স্থল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষায় সবচেয়ে বেশি অবহেলা আর উদাসীনতার শিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালে সেশনজট নিরসনের কথা বলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ২২ বছরের অভিজ্ঞতা বলে, এর বয়স যত বেড়েছে, ভোগান্তি বাড়িয়েছে তার চেয়েও বেশি। চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগে ছয় থেকে সাত বছর। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স শেষ করতে লাগে পাঁচ বছর। শিক্ষাজীবন শেষ হতে না হতেই চাকুরির বয়সসীমা পার হয়ে যায় অনেকের। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বাস্তবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ক্লাসরুম এবং শিক্ষকের সংকট আজও বহাল আছে। যেমন ঢাকার তিতুমীর কলেজে ৪৫,০০০ ছাত্রের জন্য ১৪৫ জন শিক্ষক আছেন। সিলেটের এমসি কলেজের ১০,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ জন শিক্ষক। চট্টগ্রাম কলেজে ১১৮টি মাস্টার্স কোর্সের জন্য ২১৬ জন শিক্ষক থাকার কথা, আছে ১২৩ জন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। অন্যদিকে কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, বিভিন্ন বর্ষের ইয়ার ফাইনাল, বেশির ভাগ কলেজে সরকারি ছুটি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা বন্ধে ৩ মাসের বেশি ক্লাস হয় না। সিলেবাস শেষ করার জন্য ছুটতে হয় প্রাইভেট টিউটরের কাছে। এরকম দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির মধ্যে চালু হয়েছে 'ব্যাচেলর (অনার্স) ডিগ্রি রেগুলেশন এ্যাক্ট-২০১০' বা গ্রেডিং পদ্ধতি। যাতে বলা হয়েছে, ২১০ দিন ক্লাস হতে হবে, ৩ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে এবং ১০০ নম্বর কোর্সের জন্য ৬০টি ক্লাস, ৫০ নম্বর কোর্সের জন্য ৩০টি ক্লাস হবে। কিন্তু কথায় ঘোষণা করা হলেও কার্যত এসব নিয়মাবলী বিন্দুমাত্র অনুসৃত হয়নি।

এ্যাক্টে বলা আছে	কলেজগুলোর বাস্তব চিত্র : সেশন ০৯-১০ (২য় বর্ষ)	কলেজগুলোর বাস্তব চিত্র : সেশন ১০-১১ (১ম বর্ষ)
২১০ দিন ক্লাস হতে হবে	ক্লাস হয়েছে ৬০-৯০ দিন	ক্লাস হয়েছে ৮০-৯০ দিন
ক্লাস শেষ হবার ২৮ দিন পর পরীক্ষা	১৬০ দিন পরও পরীক্ষা হয়নি	১৮০ দিন পরও পরীক্ষা হয়নি
৩ মাসের (৮৫ দিন) মধ্যে ফলাফল প্রকাশ	ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ৬ মাস পর	ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ৯ মাস পর

এর ফলাফলে গত ৩ সেশনে ঘটেছে ভয়াবহ ফল বিপর্যয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিক্ষোভ থামাতে গণহারে অটো প্রমোশন দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার লাইন নিয়েছে। কিন্তু এতে কি শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে? নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্লাসের আয়োজন না রেখে, সিলেবাস-প্রশ্ন পদ্ধতি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে অসঙ্গতি রেখে, পাঠদানকারী শিক্ষক এবং প্রশ্নকর্তার মধ্যে সমন্বয়হীনতার অবসান না ঘটিয়ে এবং শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দিয়ে, শিক্ষক স্বল্পতা দূর না করে, সারাবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্লাস আয়োজন করতে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ করা ছাড়া কি এই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটবে? এসব সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের ভাবনা না থাকলেও প্রতিবছর বেতন-ফি বাড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহের কমতি নেই। মানোন্নয়ন ফি, ফরম পূরণ ফি, ভর্তি ফরমের মূল্য বৃদ্ধি, নামে-বেনামে ফি আদায় চলছে। অন্যদিকে দলীয়করণ, নিয়োগ বাণিজ্য, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অদক্ষ প্রশাসন পদে পদে ভোগান্তি তৈরি করছে। এ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, দেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে তার অধীনে জেলার বাকী কলেজগুলোকে অধিভুক্ত করার। এর ফলে উচ্চশিক্ষার মান কিছুটা রক্ষা করা যেত। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু ৬টি বিভাগে প্রশাসনিক

বিকেন্দ্রীকরণ করে সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম নির্মাণ এবং স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল নির্মাণ না করে মাথা ভারী প্রশাসন কোনো সমাধান দিতে পারবে না।

একটা সময় পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোতে শিক্ষার একটা মান ছিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের কথাই ধরা যাক। সেখানকার রসায়ন ল্যাব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মানের। সিলেটের এমসি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেই ছিল তুলনীয়। বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির অন্যতম চর্চা কেন্দ্র। দেশের গৌরবময় আন্দোলন-সংগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। অথচ এই কলেজগুলো আজ বিবর্ণ, ম্লান। প্রকৃতপক্ষে এই কলেজগুলোকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণের পথ ত্বরান্বিত করা হয়েছে। কেবল উচ্চবিত্তরাই নয়, সেশনজটের কবল থেকে রেহাই পেতে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের সন্তানরাও ঝুঁকছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

নাইট কোর্স, ফি বাণিজ্যে আক্রান্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
সর্বক্ষেত্রে চলছে ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন

জনগণের বহু শ্রম-ঘাম-অর্থের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এমনভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যাতে এখানে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ অবারিত করা যায়। ইতোমধ্যে সে লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র। যার মূল কথা হলো, সরকার ক্রমান্বয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ প্রত্যাহার করবে। ফলে নিজস্ব আয় দিয়ে চলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। কৌশলপত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, '১. সরকার আগামী ২০ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তার বরাদ্দের অংশ ৯০% থেকে কমিয়ে ৭০% এ হ্রাস করার পরিকল্পনা করতে পারে। ২. অর্থায়নের শূণ্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব অর্থের উৎস্য তৈরি করা উচিত। ৩. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে টিউশন ও ছাত্রঋণের নতুন প্রকল্প প্রবর্তন করতে হবে।' নিজস্ব অর্থের উৎস খোঁজা মানে শিক্ষার্থীর ফি, বিভিন্ন বিভাগে সান্ধ্যকোর্স বা নাইটকোর্স খোলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ভাড়া দেয়া, দোকান-ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া দেয়া, গ্র্যাজুয়েট ট্যাক্স আরোপ করা ইত্যাদি। এরং অংশ হিসেবে সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগে নাইটকোর্স খোলা হয়েছে। ছাত্রদের জোর প্রতিবাদের পরও প্রশাসন স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় এ কাজটি করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একের পর এক বিভাগে নাইটকোর্স খোলার পাঁয়তারা চলছে। একসাথে ২২টি বিভাগে সান্ধ্যকোর্স খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুযোগ বুঝে চালু করবেন। বছর বছর বাড়ছে ভর্তি ফি। সর্বনিম্ন ১৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকার নীচে এখন কোথাও ভর্তি হওয়া যায় না। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে চার বছরের অনার্স কোর্সের ফি ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। লক্ষ লক্ষ টাকায় সার্টিফিকেট বিক্রি আজ পাবলিক-প্রাইভেটের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিচ্ছে।

এ ধরনের অন্যায়-অনিয়ম যেন নির্বিঘ্নে চলতে পারে সেজন্য খুব পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সকল গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বহুদিন ধরেই। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের নীতিকে কার্যকর করতে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'ছাত্র সংসদ'কে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রকাশ্যে ছাত্র রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রেও তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ছাত্র রাজনীতিকে। বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের ছাত্র নেতৃবৃন্দের জোরালো প্রতিবাদের কারণে টিউশন ফি বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ... ছাত্রদের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিল নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এবং একাডেমিক সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয়ভাবে ঐক্যমতে আসতে হবে।..' এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক দুই ক্ষেত্রেই চলছে চরম দলীয়করণ, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমেই হারাচ্ছে তার মুক্ত জ্ঞান চর্চার পরিবেশ, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে এখানেও অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে গবেষণার সীমিত সুযোগ সুবিধা পেয়েও জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতো পণ্ডিত মানুষের উত্থান ঘটেছে। সীমিত আয়োজন নিয়েও তাঁরা অত বড় হয়েছিলেন কেননা দেশ-মানুষের প্রতি তাদের একটা দায়বদ্ধতা ছিল। আজ সেই দায়ও নেই, রাষ্ট্রীয় আয়োজনও শূণ্যের কোঠায়। ২০১২ সালের এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণা খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ১ শতাংশের বেশি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হার ০.৯৮%, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০.৪১%, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ০.০৭%। এই সামান্য বরাদ্দ দিয়ে গবেষণা করা যায় না। আবার যতটুকু গবেষণা হয় তাও চাকরির প্রমোশন বা স্থায়ী করার প্রয়োজনে। বেশিরভাগ গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারছে না। মৌলিক বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে না বললেই চলে। অথচ গবেষণা কার্যক্রম ব্যতিত বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে কৌশলপত্রে গবেষণার জন্য বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- "The industries and private sectors should be

encouraged to come forward to sponsor/ co-sponsor university research project." অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য শিল্প কারখানা এবং বেসরকারি খাতসমূহকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা উচিত। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বা হেক্যাপের (Higher Education Quality Enhancement Project-HEQEP) মাধ্যমে গবেষণা খাতে বেসরকারি পুঁজি খাটছে। এছাড়াও পিপিপি'র মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো বেসরকারিভাবে নির্মিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক বিজ্ঞান যতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে, প্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। গত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না বললেই চলে। যেমন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগ না থাকলেও ফলিত রসায়ন পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবহেলা করে প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের ফল কি দাঁড়াবে? এ প্রসঙ্গে যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, 'একদিকে ধর্মীয়-অধ্যাত্মবাদী কূপমণ্ডূক চিন্তা অন্যদিকে বিজ্ঞানচেতনাহীন কারিগরি শিক্ষা ফ্যাসিবাদী মনন কাঠামো তৈরি করে।' এ কথার সত্যতা আমরা আজ চারপাশে তাকালেই দেখতে পাব। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিভাবে জন্ম নিচ্ছে একদল শিক্ষিত অথচ উগ্র, সংস্কারগ্রস্ত মানুষ। মৌলবাদী চিন্তার প্রসার ঘটছে অবাধে। অনেকেই নিত্যদিনের ব্যবহারে প্রযুক্তির সর্বোন্নত সেবা গ্রহণ করার পরও সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেকেলে, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাই পোষণ করছেন। শাসকশ্রেণী পরিকল্পিতভাবেই এ ধরনের একদল মানুষ তৈরি করছে যারা অন্যায় শাসন-শোষণ দেখলেও কার্যকারণ সম্পর্কে থাকবে অজ্ঞেয়। সমাজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে থাকবে উদাসীন কিন্তু হাতের কাজ বা যন্ত্র চালাতে হবে পটু।

সিলেবাস-কারিকুলামে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। জীবনের নানা ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বৈচিত্র্যময় আয়োজন থাকে, আজকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির জন্য সেটুকুও আর থাকছে না। কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, 'চাকুরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্র সংখ্যা, বিষয়বস্তু এবং সিলেবাস নির্ধারিত হবে।' কোন বিষয়গুলো চাকুরির বাজারের উপযোগী বা অনুপযোগী, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ঐতিহাসিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মানবিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ানো হয় তার সঙ্গে বর্তমান চাকুরির বাজার অথবা বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুবই কম। ইতোমধ্যে গত কয়েক বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ... স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদাসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের মতো বিষয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।' এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আসন সংখ্যা ২০০ থেকে কমিয়ে এ বছর করা হয়েছে ৮০টি। একই কারণে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুযদের ভর্তির আসন সংখ্যা কমলেও বাড়ছে বাণিজ্য অনুষদের আসন সংখ্যা। ইউজিসি'র সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বছরে কমছে গড়ে ১ শতাংশ হারে। এভাবে অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত মানুষকে চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে শিক্ষার বাজার তৈরি করা হচ্ছে। পরিণতিতে একদিকে মানবিক বোধহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে ব্যাপক সাধারণ মানুষ হারাচ্ছে উচ্চশিক্ষার অধিকার।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : মানহীন প্রতিষ্ঠানে কোটি টাকার শিক্ষা ব্যবসা

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি'র চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয় আইন পাশ হয় ১৯৯২ সালে। আইনটি যখন পাশ হয় তখন এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ কিছু ভালো ভালো কথা বলা হয়। যেমন- উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, উচ্চশিক্ষার সীমা বর্ধন, আর্থিক লাভ বা মুনাফার উদ্দেশ্যে কাজ না করা, উচ্চ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি। সেই আইনে ৪টি শর্তের কথাও বলা হয়েছিল– (ক) শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে (খ) ন্যূনতম দুটি অনুষদ চালু করার প্রস্তুতি থাকতে হবে (গ) মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং (ঘ) শিক্ষাপাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, অনুষদ ও বিভাগসমূহ স্থাপনা, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যসূচী এবং কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু আজ ২২ বছর পর দেখা যাচ্ছে দেশের ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেই কাগুজে ব্যাপারগুলোও আমলে নিচ্ছে না। সংশোধিত আইনে ৫ বছরের মধ্যে ন্যূনতম ৫ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোতে ক্যাম্পাস নির্মাণের কথা থাকলেও দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে মাত্র ১৫টির। এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কমনরুম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই। প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্সের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের কথা আইনে বলা থাকলেও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই অস্থায়ী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৫৬ ভাগই প্রভাষক। আর পূর্ণকালীন শিক্ষকদের মধ্যে ৬৭ ভাগই প্রভাষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত ১:১৫ হলেও এখানে ১:৩০ অথবা এরও বেশি।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ২০১৩ সাল পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া ৭৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫টিতেই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই। উপ-উপাচার্য ছাড়া ৫০টি আর কোষাধ্যক্ষ ছাড়া ৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। (জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪)

নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তন, অবকাঠামোগত আয়োজন না থাকলে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেতে পারে না। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে মানুষের শারীরিক, মানসিক, মানবিক, বুৎপত্তিগত ও প্রায়োগিক ক্ষমতা- দক্ষতা ইত্যাদির সুষম বিকাশের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও পরিবেশকে বুঝায়। উচ্চশিক্ষার আলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই শর্ত পূরণ আবশ্যক। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে আমরা দেখি হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, ব্যাংক, সিএনজি স্টেশন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিল্ডিং এ, অলি গলিতেই বিশ্ববিদ্যালয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালযের সবচেয়ে বেশি অনিয়ম আর্থিক খাতে। নামে বেনামে ফি আদায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোর্স ফি, রিটেক ফি সহ হাজারো ফি আরোপ করে যখন তখন। এ বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। আইনে আছে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করা হবে। কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বৃদ্ধি সহ কোনো বিষয় নিয়েই অভিভাবক তো দূরের কথা ছাত্রদেরও মতামত নেয়া হয় না। আবার ১৯৯২ সালের আইনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে 'নন প্রফিটেবল' বলে গণ্য করা হয়নি, তাই একে নিয়ে অবাধ বাণিজ্য করছে একদল শিক্ষা ব্যবসায়ী।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ছাত্ররাজনীতি করার অধিকার নেই। শুধুমাত্র পরীক্ষা আর ক্লাসের মধ্যেই বন্দি জীবন। এভাবে সমস্ত মানবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে শিক্ষা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান ঘটেছে। গত ২০১২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুনাফা করেছে ১ হাজার ৮৫০ কোটি ৪২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। একই বছরে গবেষণার পেছনে তারা ব্যয় করেছে মাত্র ৪১ কোটি ৩ লাখ ৪ হাজার টাকা, যা সামগ্রিক আয়ের মাত্র ২.৩% আর সামগ্রিক ব্যয়ের ২.৪১%। এই বছর ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি গবেষণার পেছনে এক পয়সাও ব্যয় করেনি। *(সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা)* শুধু তাই নয়, প্রায় সবগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো মৌলিক বিষয়ে (বাংলা, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি) পড়ানো হয় না। কেননা এগুলোর এখন আর বাজার মূল্য নেই। ইউজিসি'র সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট বলছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পড়ছে ব্যবসা প্রশাসনে। তবে চাকুরির বাজার আছে বলে যে বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে কখনো দেখা যাচ্ছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা শর্ত আরোপ করে চাকুরির সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে ভিটে-মাটি বিক্রি করে, সব হারিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারলেও কেউ কেউ 'সোনার হরিণ' চাকুরির সুযোগও পাচ্ছে না।

শিক্ষার খরচ বৃদ্ধির কারণে বিজ্ঞানে আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে অন্যদিকে

সামাজিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে প্রসার ঘটানো হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার

যেকোন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে, কুসংস্কার-কূপণ্ডূকতা থেকে মুক্ত হতে, সমাজে যুক্তিবাদী-কৌতূহলী-অনুসন্ধিৎসু মনন তৈরি করতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু ক্রমাগত শিক্ষার খরচ বেড়ে যাওয়ায় মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবছর কমছে। পরিসংখ্যান বলছে গত ১১ বছরে (২০০৩-২০১৩) মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমেছে গড়ে ১১ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিকে ৫ শতাংশ। স্কুল পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, অবকাঠামোগত আয়োজন প্রায় নেই বললে চলে। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট-কোচিং নির্ভরতা অনিবার্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সে কারণে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়তে চায় না বা পরিবার থেকে নিরুৎসাহিত হয়। আবার বাজার চাহিদামুখী মনোভার তৈরি হওয়ার কারণে ব্যবসায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের দিকে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা ঝুঁকছেন।

অন্যদিকে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্য থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিস্তার ঘটছে। ব্রিটিশরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ অঞ্চলে মাদ্রাসা এবং টোলভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। নিজেদের শাসনকে স্থায়ী করতে তারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে, কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছিল। একইভাবে সামাজিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে স্বাধীন দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। সাধারণভাবে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশের ছেলে মেয়েরা (কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও) মাদ্রাসায় পড়তে আসে। এখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা তো দূরের কথা, নিদেনপক্ষে চাকুরি উপযোগী শিক্ষা লাভও সম্ভব হয় না। যে কারণে মন্ত্রী-আমলা, এমনকি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে সাফাই গাইলেও নিজেদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ান না। আবার যারা এখানে পড়ে তাদের অনেকের মধ্যে ব্যক্তিজীবনে প্রবল হীনমন্যতাবোধ, কূপমণ্ডূক ধ্যান ধারণা, নিজেদের সংকীর্ণ বিশ্বাসে অটল থাকা, আধুনিক সমাজ ও তার জীবনব্যবস্থা-নারী স্বাধীনতা-সাম্যবোধের চেতনাকে ঘৃনার চোখে দেখবার মনস্তত্ত্ব নিয়ে গড়ে উঠে। সমাজে বিভাজন টিকিয়ে রাখতে এমন মানসিকতা সহায়ক।

আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষাকে 'যুগোপযোগী' করার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সাম্প্রদায়িক যে ছাঁচে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মনন গড়ে ওঠে, তাতে কিছু গণিত-বিজ্ঞান বা যাই পড়ানো হোক না কেন ওই নির্দিষ্ট ছাঁচেই তারা তৈরি হবে। সম্প্রতি মাদ্রাসা ছাত্রদের

চাকুরি উপযোগী করে তৈরি করার নাম করে সাধারণ বিষয়গুলোতে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তা কেবল হাস্যকরই নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনার পরিপন্থী। যেমন- বাংলা বইতে তারা 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' পড়বে কিন্তু গিটার বাজানো শ্মশ্রুমণ্ডিত ঝাঁকড়া চুলের জর্জ হ্যারিসনের ঐতিহাসিক ছবিটি তাতে থাকবে না। সাধারণ শিক্ষার তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে এক কিশোর হাফ প্যান্ট পরে নৌকা বাইছে, নৌকায় বসে এক কিশোরী শাপলা ফুল তুলছে। মাদ্রাসার বইয়ে এই প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে কিশোরকে পায়জামা পরানো হবে, কিশোরী পড়বে হিজাব। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে লালন শাহের লেখা একটি পদ্যের নাম 'মানবধর্ম'। বইয়ে এই কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। শিক্ষার্থীরা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে।' মাদ্রাসার বইয়ে এই কবিতার বদলে ফররুখ আহমদের পদ্য 'মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশে' পড়ানো হবে। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাঠদান করা হয় না। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই যেখানে স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা, সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এই প্রসার সমাজজীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

কারিগরি শিক্ষার ধুয়ো তুলে মূলধারার শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করছে শাসকশ্রেণী

একইভাবে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার কথা বলে আরেক দিক থেকে শিক্ষার মর্মবস্তুকে ধ্বংস করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক এই দুইভাগে ভাগ করে চাকুরির জন্য কেবল ব্যবহারিক, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষানীতিতেও এর জোরদার সুপারিশ আছে! বাস্তবে কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অস্বীকারের উদ্দেশ্য থেকেই কর্মমুখী বা স্বকর্মসংস্থানের স্লোগান তোলা হয়। তাই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা এখন ব্যাপকভাবে প্রচার চালাচ্ছে কর্মমুখী, কারিগরি শিক্ষা, বিবিএ, এমবিএ, হোটেল ট্যুরিজম, ফ্যাশন ডিজাইনিং ইত্যাদি ডিগ্রি নিলে নিশ্চিত ভাল চাকুরি মিলবে। এ জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছে। বাস্তবে চাকুরি হবে কি হবে না সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে রাষ্ট্রের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতির উপর। আর শিক্ষা তো কেবল চাকুরির জন্য হতে পারে না। ইতিহাসের সমস্ত বড় মানুষ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক - নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলদের, বিদ্যাসাগরের কথা কি ছাত্ররা জানবে নিছক চাকুরির জন্য? আসলে শাসকরা শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করে এ ধরনের ফাঁকা আওয়াজ তুলে জনগণের চিন্তাকে ভিন্ন দিকে ধাবিত করছে।

বাণিজ্যিকীকরণ ছাত্র-শিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ককে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে পরিণত করেছে

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষ তৈরি, চরিত্র নির্মাণ, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মের সাথে পরিচয় ঘটানো। এ কাজটি শিক্ষকের মাধ্যমে হয় বলে তাঁকে মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।' একজন শিক্ষক তার বুদ্ধি-বিবেক-চরিত্র দিয়ে সেই প্রাণসঞ্চারের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক কাল থেকে শিক্ষকেরা তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে আসীন হয়েছেন। যদিও নিজেদের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার মতো জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা তাঁরা পাননি। বৃটিশ-পাকিস্তানি উপনিবেশিক শক্তি এদেশের মানুষকে শিক্ষা দিতে চায়নি। তারা মনুষ্যত্ব-মর্যাদাহীন একদল গোলাম বানাতে চেয়েছিল। শত আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেদিন শিক্ষকেরা দেশপ্রেম আর মর্যাদাবোধ জাগিয়ে রাখত। মাস্টারদা সূর্যসেনের মতো শিক্ষকেরা ছিলেন তাঁদের ছাত্রদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। বীরকন্যা প্রীতিলতা একসময় শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই কালে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী ছিলেন ছাত্রদের আদর্শ। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষক এক কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিন আইয়ুব সরকার মুক্তচিন্তা করার অপরাধে অনেক শিক্ষককে চাকুরিচ্যুত করেছিলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহা ছাত্রদের বাঁচানোর জন্য বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। ছাত্র-শিক্ষকের এই সামাজিক দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক সেদিন শিক্ষার পরিবেশকে অনেক উঁচু মানে তুলেছিল।

দুঃখের বিষয়, আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বেতন-ফি বৃদ্ধির ব্যাপারে শিক্ষকদের একাংশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন অথবা মৌন সমর্থন দিচ্ছেন। শিক্ষকতার মতো একটা মহান পেশায় থেকেও অর্থের পিছনে ছুটছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও বেশি অর্থ পাওয়া যায় বিবেচনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো নিজের বিভাগে বাণিজ্যিক সান্ধ্যকোর্স চালু করে ক্লাস নিচ্ছেন। অনেকে গবেষণার নামে তথাকথিত এনজিও খুলে বিদেশ থেকে অনুদান সংগ্রহের জন্য ছুটছেন। এসবের অনিবার্য ফল হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ফি বিরোধী-নাইটকোর্স বিরোধী আন্দোলন হয়, এই শিক্ষকরা তখন আন্দোলনের বিরুদ্ধে নামেন। কারণ বর্ধিত ফি-বাণিজ্যিক কোর্স থেকে তাদের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইটকোর্সবিরোধী আন্দোলনে তাই পুলিশ ও সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি স্বয়ং ভিসিসহ কতিপয় শিক্ষক। এর বিপরীত চিত্রও আছে। ছয় জন তরুণ শিক্ষক স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন। ছাত্ররা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামলেই শিক্ষকদের বড় একটা অংশ মনে করছেন- তাদের আয়ের উপরই বুঝি টান পড়ছে। এভাবেই বাণিজ্যিকীকরণ আজ ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলে অভাব-দারিদ্রের মধ্যে দিনাতিপাত করেও

শিক্ষকরা কি কখনো ভেবেছেন ছাত্রদের বেতন-ফি বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রোজগার বাড়াতে হবে? বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলেছিলেন, "অর্থকে পরমার্থ জ্ঞানে যারা বিদ্যা-বুদ্ধি বিক্রয় করছেন, তাদের শিক্ষক বলা যায় কি? ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক কি ক্রেতা-বিক্রেতার?"

শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন-ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়

একথা সত্য যে, শিক্ষকরা এই সমাজেরই মানুষ। তাদেরও তো পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। মানসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের জন্য যদি একজন শিক্ষককে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়, তাহলে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল পেশা শিক্ষকতায় তিনি মনোনিবেশ করবেন কি করে? শাসকশ্রেণী বরাবরই শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত করেছে। এই কিছুদিন আগেও স্কুলের শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণের আন্দোলনে পুলিশি হামলার শিকার হতে হয়েছিলো। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাসা ভাড়া, গাড়ি ভাড়াসহ সমস্ত কিছুর মূল্য বৃদ্ধির কারণে নির্দিষ্ট বেতন মাসের অর্ধেকে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাই কোচিং-প্রাইভেটে যেতে হয়। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ লিখেছেন, 'বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম কয়েকটি দেশের সারিতে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষকদের বেতন শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ।' শিক্ষকদের বেতন-ভাতার এই দিকটি রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেট এবং শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। একদিকে কম বেতন, অন্যদিকে সামাজিক অনিশ্চয়তা আর সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশা শিক্ষকদের যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জনে মরিয়া করে তুলেছে। ফলে স্কুল পর্যায়ে কোচিং, প্রাইভেটের সাথে শিক্ষকরা যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই শুধু আইন করে কোচিং-প্রাইভেট-টিউশন বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষক সমাজের উপযুক্ত বেতন কাঠামো, সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক সমাজকেও অনুধাবন করতে হবে যে, নৈতিকভাবে তারা যে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবেন তাদের উপরই কি আয়ের জন্য নির্ভর করবেন? নাকি যে সরকারী নীতি শিক্ষকদের বঞ্চিত করে, শিক্ষার মর্মচেতনাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে ছাত্র-শিক্ষককে মুখোমুখি দাঁড় করায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হবেন? লড়াইয়ের এই পথেই ছাত্র-শিক্ষকের উভয়েরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষাখাতে কখনই প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ হয়নি

(এই অংশটুকু পরে যুক্ত হবে) শিক্ষাখাতে ২৫ ভাগ বাজেট বরাদ্দের দাবি দীর্ঘদিনের। ঐতিহাসিক ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনেও অন্যতম দাবি ছিল এটি। কিন্তু জনগণের অন্য অনেক দাবির মতো এই দাবিটিও উপেক্ষিত হয়েছে বারবার। এরপর ৫২ বছর কেটে গেছে! স্বাধীনতার পর মানুষের প্রত্যাশা ছিল এবার বুঝি সকলের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হবে। কিন্তু উল্টো পথেই হেঁটেছে রাষ্ট্র। সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, অসংখ্য ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভাজিত করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ক্রমাগত কমেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ১৯৭২ সালেও যেখানে জাতীয় বাজেটের ২১ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১.৬৬ শতাংশ, যা জিডিপি'র ২.১১ শতাংশ। শিক্ষাখাতে পৃথিবীর সর্বনিম্ন বাজেট বরাদ্দকারী দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন, "পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে কম বরাদ্দ দেয়া হয় বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে।" দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত ও নেপালেও বরাদ্দ জিডিপি'র ৪ শতাংশের বেশি, ভুটানে ৫.২ শতাংশ সেখানে বাংলাদেশের এই হাল! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ জাপানের পরবর্তীতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারার অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধের পরের বছরগুলোতে শিক্ষাখাতে তাদের বিপুল বরাদ্দ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ মালয়েশিয়া পুঁজিবাদী অর্থেও অর্থনীতির যে অগ্রগতি ঘটিয়েছে তার অন্যতম কারণ শিক্ষাখাতে তাদের বরাদ্দ জিডিপি'র ৮ শতাংশেরও বেশি। সাধারণ অর্থেও একটা পুঁজিবাদী দেশ তার উন্নতির জন্য শিক্ষাকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়, বাংলাদেশের শাসকদের সেটুকুও নেই।

বাজেটের প্রশ্ন আসলেই একই উত্তর চিরকাল আমাদের শুনতে হয়। তা হলো 'টাকা নেই'। কিন্তু প্রতিবছর বাজেটের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, কত শত কোটি টাকার অপচয়। সরকার সেসমস্ত খাতেই অর্থ বরাদ্দ করে যেখানে ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাটের মাধ্যমে তার মন্ত্রী-এমপি-আমলারা কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারবে। এবারেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের যে বাজেট হয়েছে তাতেও আমরা এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব। প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বাজেট এবার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ভ্যাটের আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এই বিশাল পরিমাণ টাকার দায়িত্ব সাধারণ মানুষকে নিতে হবে। আবার ব্যাংক-সহ রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সীমাহীন দুর্নীতি, শেয়ারমার্কেট, হলমার্ক, ডেসটিনি গ্রুপ নানা প্রতিষ্ঠানের নজিরবিহীন আর্থিক জালিয়াতি, প্রতারণা, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার ইত্যাদি বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় কিছু উল্লেখ না থাকায় প্রকারান্তরে এমন অপকর্মকে একভাবে হালাল করে নেয়া হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার বিধান অক্ষুণ্ন রেখে এদেরকে প্রকারান্তরে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সামরিক খাতসহ অনুৎপাদনশীল খাতে এবারও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও এর সামান্য অংশই ব্যয় হবে শিক্ষা বা গবেষণা খাতে, মূলত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনেই বেশিরভাগ ব্যয় হবে।

সরকারি নীতি বাস্তবায়নে আজ্ঞাবহ প্রশাসন স্বায়ত্তশাসন খর্ব করছে, বন্ধ করতে চাইছে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র দলীয়করণ এবং সরকারি কর্তৃত্ব বাড়ানোর ফলে পুরো শিক্ষা কার্যক্রমে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির প্রসার ঘটেছে। মন্ত্রী-এমপিদের নিয়োগ বাণিজ্য, বদলি তদবির এবং এমপিও ভুক্তিকরণে ব্যাপক টাকার লেনদন শিক্ষা প্রশাসনকে সীমাহীন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। অন্যদিকে স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সরকারদলীয় নেতাদের বিভিন্ন পদ দখল ভর্তি বাণিজ্য এবং নিয়োগ বাণিজ্যকে সুগম করেছে। সরকার ১ টাকা ফি বাড়ালে গভার্নিং বডি ৫ টাকা বাড়িয়ে নিচ্ছে। শিক্ষা পরিচালনার সাথে মুনাফালোভীদের নীতিহীন সম্পৃক্ততা যত বাড়ছে ততই শিক্ষাবিদ-অভিভাবক-বিদ্যোৎসাহী মানুষেরা দূরে সরে যাচ্ছে।

বহু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নানা অজুহাতে হরণ করা হচ্ছে। এরই সর্বশেষ নজির 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনের পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিপূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসবে। দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। এই কমিশনের মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নজরদারি চালানো যাবে। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের নিয়োগের ক্ষমতাও দেয়া হবে কমিশনকে।

দেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোনো বালাই নেই। সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিবেচনাই আজ ভিসি হবার প্রধান যোগ্যতা। শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিয়ম-নীতির চেয়ে দলীয় বিবেচনাই প্রধান হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সরকার একদল অনুগত ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসিয়েছে এবং যেকোন অগণতান্ত্রিক এবং বাণিজ্যিক নীতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারছে। ন্যায্য দাবিতে ছাত্ররা কখনও আন্দোলনে নামলে এই অনুগত-সাজানো প্রশাসন ছাত্র আন্দোলন দমন করে। ফলে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর কখনও নেমে আসে বহিষ্কারাদেশ, পুলিশি আক্রমণ। এসব দিয়েও কাবু করতে না পারলে, সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের দিয়ে আন্দোলন দমানো হয়। কি আওয়ামী লীগ, কি বিএনপি- সব আমলেই একই ঘটনা। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, নতুন প্রতিষ্ঠিত পাবলিক (সরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে সকল গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী মনস্তত্ত্ব তৈরি করার আয়োজন চলছে। কিন্তু যুক্তি করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে নাকি সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব বন্ধ হবে। এভাবে যে সন্ত্রাস বন্ধ হয় না তা সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা দেখলেও আমরা বুঝতে পারব। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকার পরও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মারামারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক প্রাণ হারিয়েছে। বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে তাদের অন্যায় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের শক্তিকেই দমন করতে চায়।

প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনা বাণিজ্যিকীকরণেরই ফলাফল

পরীক্ষা মানেই শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নয়, তার পুরো শিক্ষা পদ্ধতিরই পরীক্ষা। এর মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারল তা যেমন যাচাই হয়, তেমনি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে কতটুকু শেখাতে পারল তাও বোঝা যায়। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত শিক্ষক, সিলেবাস, পাঠদান পদ্ধতি, সরকারসহ অনেকের ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর মূল্যায়নটি পরীক্ষা পদ্ধতির মূল বিষয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীর ভালো রেজাল্টই যেন পরীক্ষায় সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি। কোচিং সেন্টারগুলোও এর সুযোগ নিচ্ছে। স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির পরীক্ষাগুলোতে কোচিং বা গাইড বই লেখকদের সাফল্যের শতভাগ নিশ্চয়তাসহ সাজেশনের প্রচার দিয়ে চলছে রমরমা বাণিজ্য। এ সমস্ত কোচিং সেন্টার এবং গাইড বই লেখকদের সাথে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অনেক পুরনো। দীর্ঘদিনের প্রশ্রয় এবং এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আজ মহামারী রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনী পরীক্ষা এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্যের খবর পত্রিকায় এসেছে। অতীতেও যখন এই ঘটনা ঘটেছে তখন সরকারের পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস যে একটি গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জড়িতদের শাস্তিও হয়নি। এবারও উচ্চ মাধ্যমিকে একের পর এক সকল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সরকার প্রথমে এটাকে গুজব বলে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে খবরটি আসা শুরু করলে শিক্ষামন্ত্রী বলা শুরু করলেন, 'এটা তাকে সরানোর ষড়যন্ত্র।' কোচিং ব্যবসায়ীরা নাকি তার বিরুদ্ধে লেগেছে। ফেসবুকে একটি বিশেষ পেজ-এর মাধ্যমে এসব প্রশ্নপত্র কেনা-বেচার খবর ছাত্র-অভিভাবকদের মুখে মুখে। র‍্যাব-পুলিশ চাইলেই এসব সাইবার অপরাধীদের ধরতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ছাড়া এসব কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা আমাদের দেশের দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিরই ফলাফল।

আজ প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করার জন্য ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, হয়ত লোক দেখানো কিছু ব্যবস্থাও নেয়া হবে। কিন্তু শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার লাগামহীন ঘোড়া যেভাবে ছুটছে তাকে থামানো না গেলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রশ্ন ফাঁস রোধ করা যাবে না। আমরা জানি ব্যবসা মানেই মুনাফা। শিক্ষা যখন মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন ছাত্র-শিক্ষক-প্রশ্নপত্র প্রণয়নের

সাথে যুক্ত কর্মকতা-কর্মচারি কারো মাঝে নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ এসব কাজ করে না। তাই বাণিজ্যিকীকরণের সর্বগ্রাসী নীতি থেকে সরে এসে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এই নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

প্রতিবাদের মনকে নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবে ছাত্র-যুব সমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো শিক্ষার উপর এই যে আক্রমণ, দেশে এত অন্যায়, জনজীবনের সমস্যা– এসব নিয়ে আমরা ভাবতে চাইছি না। বাণিজ্যিকীকরণের নীতি ও শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর ভিত নাড়িয়ে দেবার মতো কোনো আন্দোলন গড়ে উঠছে না। অথচ এরকম পরিস্থিতি কি পাকিস্তান আমলে কল্পনা করা যেত? '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা সংকোচনবিরোধী লড়াই, '৬৯-এর আইয়ুববিরোধী লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদবিরোধী সংগ্রামে এদেশের ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল লড়াই আজও আমাদের প্রেরণা। উত্তাল যৌবন তরঙ্গ শাসকশ্রেণীর সকল জনবিরোধী নীতিকে রুখে দিয়েছিল। ছাত্র-যুব সমাজের সামনে সেদিন একটা আদর্শ ছিল। শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজের আদর্শ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে সেই আদর্শের বাস্তবায়ন হলো না, পুঁজিবাদী অর্থনীতিই বহাল থাকল। শাসকশ্রেণী তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্ররাই প্রতিবাদের শক্তি। শুধু বন্দুক-কামান দিয়ে এ শক্তিকে দমানো যায় না। তাই বিবেক-মনুষ্যত্বকে মেরে দাও। স্বপ্নহীন করো, হতাশায় ডুবিয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দাও। অথবা ভোগবাদে আচ্ছন্ন করে 'খাও দাও স্ফূর্তি কর' এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দাও। তাতে অধিকারহীনতায়ও ছাত্র সমাজ চোখ বুজে থাকবে। হতাশা ও ভোগবাদ বিস্তার ঘটাচ্ছে মাদকের। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, দেশের প্রায় ১ কোটি তরুণ-তরুণী মাদকের নেশায় আসক্ত। পাড়া-মহল্লা তো বটেই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মাদকের অবাধ ও বিপুল বিস্তার ঘটে চলেছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন ইয়াবার কেনাবেচা হয় ৭ কোটি টাকার! একইভাবে আরেকদল তরুণ-তরুণী চারিদিকের অন্যায়-নোংরামি দেখেও তার কার্যকারণ বুঝতে না পেরে হয়ে উঠছে কপাল বিশ্বাসী কিংবা আধ্যত্মবাদী। ইহকালের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে কেবল পরলৌকিক জীবনের মধ্যেই শান্তি খুঁজে ফিরছে। এভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিপুল একদল মানুষ তৈরি হচ্ছে যাদের এত অনাচার দেখার পরও তারুণ্যের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জেগে উঠছে না। এছাড়া শাসক দলগুলোর সাথে যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর টেন্ডারবাজি-হলদখল-ভর্তি বাণিজ্য-খুনোখুনির মতো কর্মকাণ্ড তো আছেই। এটাকেই শাসকরা রাজনীতি বলে চালাতে চায়। এদের অধঃপতিত কর্মকাণ্ড দেখে ছাত্রসমাজের বড় একটা অংশ রাজনীতিবিমুখ মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে। রাজনীতিবিমুখতা বা ঘৃণা দিয়ে কি অবস্থার বদল ঘটবে? ঘটবে না। গত ৪৩ বছরের ইতিহাস তাই বলে।

নির্বিকারত্ব নয়, চাই ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ

অপরাজনীতিকে বর্জন করব, ঘৃণা করব কিন্তু কি নির্মাণ করতে চাই? ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা না করে কি অন্যায্যতা দূর করতে পারব? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইটকোর্সবিরোধী আন্দোলন কিংবা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদ হত্যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সমবেত লড়াই যে ন্যায়নিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক আন্দোলনের সুর তুলে ধরেছে, তার বিকাশের পথেই শিক্ষার অধিকার তথা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রশ্নটি যুক্ত হয়ে আছে। তাকিয়ে দেখুন- ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। শিক্ষাসহ জনসংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অব্যাহত বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ ও ব্যয় সংকোচনের বিরুদ্ধে হাজার মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তাই রাজনীতি দু'ধরনের। এক রাজনীতি শোষণ-লুটপাট করে, মনুষ্যত্ব-চরিত্র নষ্ট করে। আরেকটি রাজনীতি মনুষ্যত্ব দেয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বোধ গড়ে তোলে।

তাই নির্লিপ্ততা বা নির্বিকারত্ব নয়, আসুন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষের মিলিত শক্তিতে শিক্ষার উপর সর্বনাশা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, রচনা করি মানবিক বিকাশের পথ।